একটি শহরের অলৌকিক কাহিনি

মানব মুখোপাধ্যায়

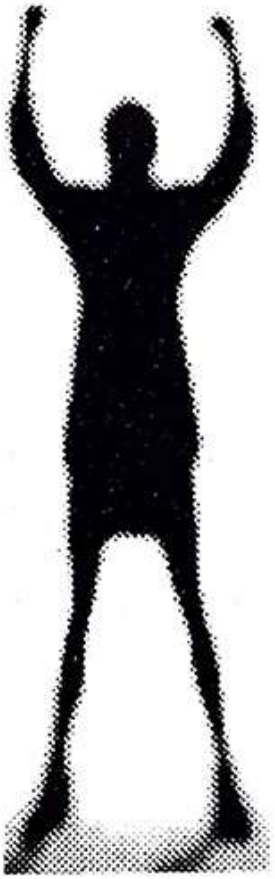

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ এক ॥

রাতের ট্রেনটা কখন আসবে কোনো ঠিক নেই। টাইমটেবিলে লেখা আছে, আসার কথা এগারোটা পঁচিশে, কিন্তু বারোটা সাড়ে বারোটার আগে ট্রেনের টিকিও দেখা যায় না। আধঘণ্টা আগে ঘণ্টা বাজলেই বোঝা যায়, তিনি আসছেন। সন্ধের পরই স্টেশনটা ঘুমিয়ে পড়ে। সাড়ে ছ-টার ট্রেন চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যেই গোটা চত্বর ফাঁকা। গরমকালে তাও রাত পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে কিছু লোকজন থাকে, অন্ধকারে মধু গোঁসাইয়ের লোকেরা গাঁজার ঠেক বসায়। সুবলা মাসির দু-একটা মেয়েকে দেখা যায় এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করতে। হাওয়া খেতেও কিছু লোকজন জড়ো হয়। তবে নানা কারণে প্ল্যাটফর্মটার বদনাম আছে, কাজেই তখনো যে খুব ভিড় হয় তা নয়। আসলে প্ল্যাটফর্মটা রাস্তা থেকে অনেকটা উঁচুতে। স্টেশনের বাড়িটা রাস্তার লাগোয়া, সে-বাড়ির পাশ দিয়ে খাড়া ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উঠে তবে প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনের এপার থেকে ওপারে যাবার রাস্তাটা রেললাইনের তলা দিয়ে, তাই নেহাত দরকার না পড়লে কেউই ওপরে ওঠে না। শীতকালে তো কথাই নেই, আর গত দু দিনে শীতটাও পড়েছে জাঁকিয়ে। শেষ যে লোককে নব নামতে দেখেছে সে হল হেমন্ত। 'অন্ধ নাচারকে দুটি ভিক্ষে দাও' বলে ভিক্ষে করলেও, হেমন্তের আসলে বাঁ চোখ কানা, ডান চোখে দিব্যি দেখতে পায়। কিন্তু সে-ই বা এত রাতে কী করছিল? অবশ্য হেমন্তের কাজকারবার আলাদা, সত্যি মিথ্যে জানে না, কিন্তু লোকে বলে, সুবলা মাসির হয়ে স্টেশনের কাজকর্ম হেমন্তই দেখাশোনা করে।

স্টেশনের সামনের চাতালটায় আলো জ্বলে না বহু দিন। আলো বলতে আশেপাশের দোকানের আলো যেটুকু। কিন্তু তারাও শীতের রাতে খদ্দেরের অভাবে এক এক করে ঝাঁপ ফেলেছে অনেকক্ষণ। এখন খোলা বলতে দুটো, সুশান্তের পান বিড়ি আর রামপূজনের ছোলামুড়ির দোকান। সুশান্তের দোকান অবশ্য রোজই খোলা থাকে এ সময়। স্টেশনবাড়ির দালানের পেছনে রামবাবুর

চোলাইয়ের ঠেক। দিনের বেলায় সামনে ঘুগনি, আলুর দমের একটা ঢপ থাকে, সন্ধের পর সে-সব উঠে যায়। সুশান্তের দোকানের খদ্দের আসে ওই ঠেক থেকে। কিন্তু রামপূজনের দোকান আজ এত রাত পর্যন্ত খোলা কেন, কে জানে। স্টেশনের ছোটো রাস্তা যেখানে গিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়েছে, সেই মোড়টায় কারা যেন পুরোনো সাইকেলের টায়ার জ্বালিয়েছে, তাকে ঘিরে একটা ভিড়। সেই জ্বলন্ত টায়ার আর দুটো দোকানের আলো মিলে তাদের এই রিকশা স্ট্যান্ডে যত না আলো, তার থেকে বেশি আঁধার।

স্ট্যান্ডে পাঁচটা রিকশ। তার থার্ড লাইন। অবশ্য এত রাতে ফার্স্ট লাইন আর লাস্ট লাইন, সবই এক। ফার্স্টে সনাতন, পরের লাইন আব্বুর, তারপর তার, তারপরে জব্বর, কিন্তু শেষ লাইনটা কে দিল সেটা নব খেয়াল করেনি। সে চাদর মুড়ি দিয়ে সিটে বসে, আশেপাশে কেউ নেই। আগুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু পোড়া টায়ারের গন্ধে তার ভীষণ গা গোলায়। তাই এই হাড়কাঁপানো শীতেও সে চুপচাপ একা বসে।

ওপরের প্ল্যাটফর্মে কেবল দুটো আলো জ্বলে। একটা নীচে নামার খাড়া সিঁড়িটার মুখে, আর একটা প্ল্যাটফর্মের একদম দক্ষিণ দিকে। দূরের আলোটার চারদিকে গোল হয়ে আছে কুয়াশা। এ স্টেশনে চালু একটাই প্ল্যাটফর্ম। মাঝখানে একটা ভাঙাচোরা প্ল্যাটফর্ম, যেটা ফাঁকাই পরে থাকে, আর তারপর সারিসারি রেল লাইন। যখন বড়ো নদীর ওপর রেলব্রিজ হয়নি, তখন এই স্টেশনের ছিল রমরমা। অনেক দিন হয়ে গেল, তাও নবর চোখে ভাসে, সারাদিন গাদাগাদা ট্রেনের যাতায়াতে স্টেশনটা একদম গমগম করত। লাইনের পর লাইন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মালগাড়ি। এখন শীতের রাতে একদম খালি পড়ে আছে লাইনগুলো। দিনের আলোয় দেখা যায়, চালু প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া লাইনটা বাদে বাকি লাইনগুলোতে জং ধরেছে। মাঝদুপুরের রোদেও সেগুলো আর চকচক করে না। একদম শেষ লাইনের ওপর বহুদিন থেকে দাঁড়িয়ে আছে গোটা চারেক মালগাড়ির ডিব্বা। রেল কোম্পানি কেবল না, এই টাউনের লোকেরাও ওগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গেছে। লাইনগুলো শেষ হলে জমিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে টাউনের একমাত্র কবরখানার দিকে। পার্টিশনের আগে কালীটোলার দিকে সবটাই ছিল মুসলমান বসতি, এখন আছে বড়োজোর বিশ-পঁচিশ ঘর। আর কবরখানাও আস্তে আস্তে হয়ে গেছে ঝোপজঙ্গলে ভরা পোড়ো জমি। কবরের ওপর ভাঙাচোরা ইটের ঢিপিগুলো শুধু জানান দেয়, এর নীচে মরা মানুষের কবর আছে। কিন্তু নতুন হোক পুরোনো হোক, কবরখানা, তাই গোটা টাউনের লোকেরা

জায়গাটা এড়িয়ে চলে। দু-একটা নতুন কবর যা দেওয়া হয়, কবরখানার সামনের দিকে, রেললাইনের লাগোয়া দিকটায় বিশেষ কেউ আসে না। কয়েক বছর আগে বানজারারা এসে ঠেক গেড়েছিল পড়ে থাকা মালগাড়ির ডিব্বাগুলোয়। তারপর একদিন সন্ধের সময় স্টেশন রোডের ছেলেদের সঙ্গে ছুরি মারামারি হল, আর পরের দিন সকালে বানজারারা হাওয়া। তারপর থেকে ডিব্বাগুলো আবার খালি। ডিব্বাগুলোর এখন রং চটে গেছে, ভেতরে আগাছা গজিয়ে উঠেছে। শীতের উত্তরের হাওয়া প্ল্যাটফর্মের ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইনগুলোর ওপর দিয়ে, ধাক্কা খাচ্ছে ডিব্বাগুলোর গায়ে। ভাঙা ডিব্বার ফুটোফাটা দিয়ে হু হু করে ঢুকছে বরফের মতো ঠান্ডা হাওয়া, অমঙ্গলের শাঁখের আওয়াজ তুলছে। আর একটা অংশ ছুটে যাচ্ছে কবরখানার ওপর দিয়ে, বুনো কুল আর বাবলাগাছের পাতা বেয়ে সেই বরফঠান্ডা হাওয়া নেমে আসছে কবর চাপা দেওয়া শ্যাওলা ধরা ইটের স্তূপে। এ রাত নবর ভালো লাগছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে আজ অমাবস্যা, কিন্তু সে নিশ্চিত না, কারণ বহুদিন হল নব চাঁদের দিকে তাকায়নি।

নবর হঠাৎ সব রাগ গিয়ে পড়ল নিত্যবাবুর ওপর। শালা, এই লোকটার জন্যই আজ এত দুর্ভোগ। এই রিকশর লাইনে বারো-তেরো বছর হয়ে গেল, কোনো দিন এ রকম রাতে ডিউটি করতে হয়নি। তার ঘর স্টেশন থেকে অনেকটা দূর, টাউনের একদম অন্য দিকে। ঝামেলা শুরু গত বছর শীতকাল থেকে। নিত্যবাবু কলকাতা না কোথায় যেন গিয়েছিল। রাতের প্যাসেঞ্জার যথারীতি দু'ঘণ্টা লেট। অন্য দিন কেউ না কেউ থাকে, তাদের কপাল খারাপ, সেদিনই রাতে স্টেশনে কেউ ছিল না। ওই শীতের রাতে বুড়োকে একা হেঁটে ফিরতে হয়, মাঝখানে কুকুরের তাড়া খেয়ে ধুতিটুতি ছিঁড়ে একশা। অন্য কেউ হলে তাও কথা ছিল, নিত্যবাবু টাউনের চেয়ারম্যান। পরের দিনই তলব, সবাই তাদের এই মারে কি সেই মারে। সেদিনই ফতোয়া জারি হয়ে গেল রোজ দশজনকে হোলনাইট ডিউটি দিতে হবে। হাতে পায়ে ধরে রাজি করা গিয়েছিল—সারা রাত না, থাকতে হবে রাতের প্যাসেঞ্জার অব্দি, আর দশটা কমে সাত হয়েছিল। নিজেরা বসে ডিউটি ভাগ করে নিয়েছিল। শুধু ছাড় ছিল কদমতলার শিবুর [illegible] বউটা পাগল। রাতে ফিরে শিবু রান্না করলে বাচ্চাগুলো খেতে পায়। নবর ডিউটি মাসের প্রথম শুক্কুরবার, অবশ্য আগে জানালে অসুখবিসুখ দরকার-অদরকারে ছাড় আছে। সবাই ঠিকঠাক ডিউটি করে না, আজই যেমন সাতজনের জায়গায় আছে পাঁচজন। তবে নব ঠিকঠাক ডিউটি করে। এক-আধ দিন ডিউটিতে ডুব দিলে কিছুই না। কখনো-সখনো নিত্যবাবুর

দারোয়ান আছে লখন, সে দেখতে আসে সবাই ডিউটি দিচ্ছে কিনা। বিশেষত যখন লখনের মাল খাবার পয়সার টান পড়ে, তখন। সে আর ক-দিন? কিন্তু লখন এলে ঝামেলা। ডিউটিতে না থাকলে ঝামেলা, বোর্ডের অফিসে গিয়ে দু টাকা ফাইন দাও। আর ডিউটিতে থাকলে ডবল ঝামেলা, লখন এদিক-ওদিক দেখে রামবাবুর ঠেকে গিয়ে বসবে। তিনি মাল গিলবেন আর তার পয়সা দিতে হবে লাইনে যারা আছে তাদের। থানার সেপাইগুলোর সে ঝামেলা নেই, অন্তত ওদের মাল খাবার পয়সা কাউকে দিতে হয় না, ওটা রামবাবুর যায়। মাল খাওয়া হয়ে গেলে লখনকে আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়। মাঝখান থেকে রাত জেগে বিনা পয়সার ডিউটি। মনে মনে মা-মাসি তুলে খিস্তি মারতে মারতে যখন নিয়ে যাবে তখন মালে টইটুম্বুর হয়ে সওয়ারি গলা ছেড়ে গান ধরবেন,

বাবুর বিবির ঢং দেখে ভাই
বুকখানি মোর জ্বলে রে

তখন মনে হয় গাড়ি থেকে নামিয়ে পোঁদে এক লাথি মেরে শুয়োরের বাচ্চাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে চলে যাই।

কিন্তু এখন জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে রিকশয় বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। এই জাড়ের হাত থেকে বাঁচবার একটা রাস্তা হল রামবাবুর ঠেকে গিয়ে বসে পড়া, কিন্তু সে রাস্তাও তার বন্ধ।

গত বছর আশ্বিনে পুজোর ঠিক আগে ব্যথাটা উঠেছিল। টানা প্রায় তিন দিন। কমে যাবে ভেবে সেদিনও নব গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু ব্যথাটা বেড়ে যাওয়ার বিকেলের পর আর টানতে পারেনি। সারারাত ব্যথায় কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করেছে, সকালবেলায় বিছানায় মাথা তোলার মতো অবস্থাও ছিল না। শিবতলার ঠাকুরের জল, সুশীল ডাক্তারের হোমিয়োপ্যাথির গুলি—কিছুতেই যখন ব্যথা কমে না, তখন চম্পাই ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের ডাক্তার পেট টেপাটেপি করে তার ব্যথা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওষুধ দিয়েছিল দেড় টাকার। কিন্তু ব্যথাটা কমেছিল সে-দিন রাত থেকেই। ডাক্তার তার আসল সর্বনাশ করেছিল অন্য জায়গায়। পেট-টেট দেখে ওষুধ লিখতে লিখতে বলেছিল, আর কোনো দিন যদি মদ খাও, আমার কাছে আসতে হবে না ; হাসপাতালের পেছনে মর্গ আছে, সোজা ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়বে। ব্যাস, চম্পাকে আর কে পায়। বোধহয় হাসপাতালের গেট থেকে খিস্তি শুরু, আর সে খিস্তি পারলে এখনো দেয়। তারপর থেকে নব আর মাল ছোঁয় না। কিছুটা সেই

পেটব্যথার ভয়ে, আর কিছুটা চম্পার খিস্তির ভয়ে। কিন্তু এখন এই হাড়কাঁপানো জাড়ে গুটিশুটি মেরে বসতে থাকতে থাকতে ভীষণ ইচ্ছে করছে একবার ঠেকে দিয়ে বসতে। এই ঠান্ডায় জলটল না মেরে বড়ো এক চুমুক—তেতোতে মুখটা একদম বিষ হয়ে যাবে, গলার কাছ থেকে জ্বালাতে জ্বালাতে মালটা নামতে থাকবে পেটের দিকে, কিন্তু একটু পরেই মড়ার মতো ঠান্ডা পা-টায় সাড় ফিরে আসতে থাকবে। এই সাড় ফিরে আসাটা যে কী আরামের! তার কিছুক্ষণ পরে গরম হবে কানটা, তখন চাদরটা মাথা থেকে খুলে বসতে পারবে। নাকটা তখনো ঠান্ডা থাকবে, সে থাক গিয়ে। আচ্ছা, মাল খাবার দরকার নেই শুধু ওই ঠেকে গিয়ে বসবে। এই বরফের মতো ঠান্ডার থেকে রামবাবুর ঠেকটা অন্তত গরম। দরমার বেড়াটায় যতই ফাঁকফোকর থাক, এই বরফের মতো ঠান্ডার থেকে রামবাবুর ঠেকটা অন্তত গরম। দরমার বেড়াটায় যতই ফাঁকফোকর থাক, এই চাক্কুর ফলায় মতো হাওয়াটা থাকবে না। আর অতগুলো লোক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলে গরমও হয়।

কিন্তু ওখানে গিয়ে বসলে চেনাজানা যারা আছে, তারা নানা রকম আওয়াজ দেবে। মাল ছাড়া নিয়ে তাকে কম আওয়াজ খেতে হয়নি। আর নানা তালে যদি মালটা খেয়ে ফেলে? কী হবে? এতদিন পরে একবার যদি খায়ও ব্যথাটা নিশ্চই আবার উঠবে না। কিন্তু চম্পা? ভয়টা সেখানেই। আচ্ছা, আজ যদি সে মাল খায়, কী হবে? সে তো কারও বাপের পয়সায় খাচ্ছে না। নব জানে, আজ চম্পা কিছু বলবে না, শধু গুম হয়ে থাকবে আর কয়েক বার তাকে মাপবে। আসল খেল শুরু হবে কাল সকাল থেকে—নবর বাপঠাকুরদা দিয়ে শুরু হবে, আর শেষ হবে কাকে দিয়ে আর কত দিনে, ভগবানও জানে না। আগে আগে মাথা গরম হলে সে হাত চালিয়ে দিত। তাতে মুখ বন্ধ হত, কিন্তু ঝামেলা বাঁধত অন্য দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ, আর পরের দিন সকাল থেকে হেঁশেল বন্ধ। ঘরে ছেলেপুলে নেই, বাবুদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করতে গিয়ে দুপুরে কারো রোয়াকে শুয়ে থাকলে কে আর কী বলবে। প্রথম প্রথম সে চম্পাকে খুঁজতে বেরুত। তার মতো চম্পারও তিনকুলে কেউ নেই। বিয়ের আগে যে মাসির ঘরে চম্পা থাকত, ক-মাস পরে সে মাসিও রেলে কাটা পড়ার পর আত্মীয় কুটুমের পাট খতম। খোঁজ করা মানে, যে সব বাড়িতে কাজ করতে যায়, সেখানে। খুঁজে পাবার পর হাতে-পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনা। পরে অবশ্য আর খুঁজতে বেরুত না। এমনিতেই সারা সকাল রোদ্দুরে রোদ্দুরে গাড়ি টেনে মাথা গরম থাকে, তারপর বাবুদের বাড়ি থেকে চম্পাকে ডাকতে গেলে গিন্নি মায়েরা নানা কথা শোনায়।